LOTUS BUD

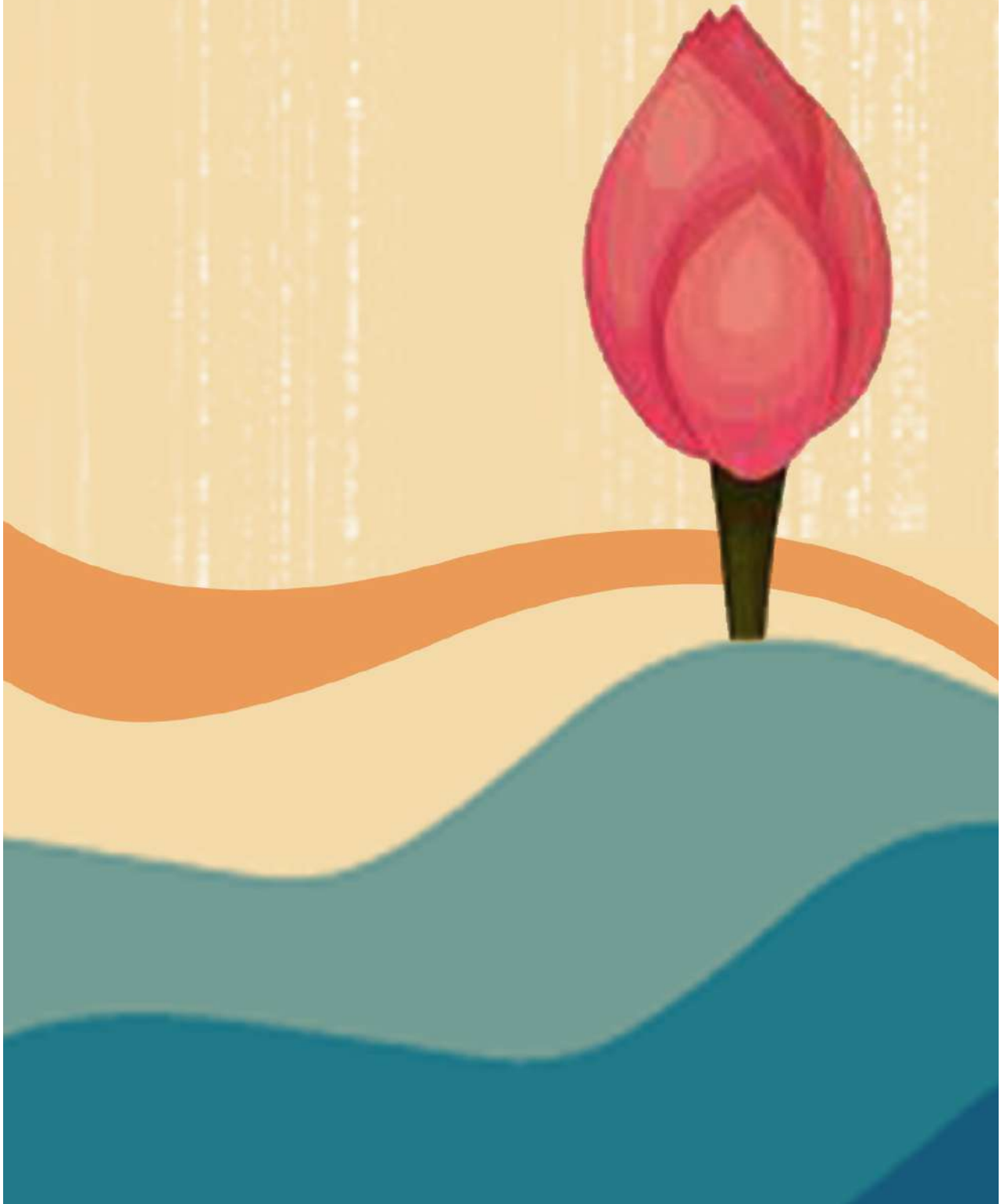

বাংলা

(সম্পাদকীয় বিভাগ)

হ্যাঁ, র‍্যাগিং একটি অত্যন্ত গর্হিত সামাজিক অপরাধ, তা সে যতই অবচেতন মনে দাদাগিরি হোক না কেন! সভ্যতার অগ্রগতিতে মানুষ যতই সমান তালে পা মিলিয়ে আর আধুনিকতার ফ্যাশনদুরস্ত হওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, রক্তের মধ্যে সেই প্রবাহমান কাল ধরে 'উৎপীড়ক' নামের এক পশু বিরাজমান। আর সেই প্রভুত্ব ফলাবার ইচ্ছে যখন মাথাচাড়া দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ জেগে ওঠে তখন অকারণ উৎপীড়নের ইচ্ছেটাও জেগে ওঠে। এটা বিশেষত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে দেখা যায়। নবাগত ছাত্রছাত্রীদেরকে পুরোনা তথা দ্বিতীয় বা তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা এই ধরনের শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালায়। এর ফলশ্রুতিতে বহু ছাত্রছাত্রী মারা গিয়েছে এবং দৈহিক ও মানসিকভাবে অনেকে চিরপঙ্গু হয়ে গিয়েছে। কেবল ছাত্রসমাজে নয়, বাস্তবে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটেও এই 'র‍্যাগিং নামক অকর্মটি বলবৎ। একমাত্র আইন বলবৎ করেই

মানুষের জান্তব তথা পাশব প্রবৃত্তির নিরসন করা বোধহয় সম্ভব। কারণ সচেতনতার বৃদ্ধির দ্বারা সচেতন মানুষের স্বতঃপ্রবৃত্ত-কৃত এই অন্যায়কে রোধ করা প্রায় অসম্ভব।

প্রাককথা

চলমান পৃথিবীতে 'র‍্যাগিং' একটি অত্যন্ত পরিচিত আতঙ্কজনিত শব্দ। বিশেষত ছাত্রসমাজে ছাত্রছাত্রীদের কাছে এটি পারস্পরিক আলোচনা বা জোরালো সক্রিয় গণমাধ্যমের কল্যাণে র‍্যাগিং-এর বীভৎসতা লোকচক্ষুর আড়াল অন্ধকারে আর থাকছে না। এক অমানবিক উৎকট কৌতুকের শিকার হল এই র্যাগিং-এর কবলে পড়া ছাত্রসমাজ, বিশেষত আবাসিক প্রথম বর্ষের ছাত্রসমাজ। এই র্যাগিং কেবল ছাসমাজে নয়, ব্যাপকতর অর্থে সমগ্র সমাজের নানা স্তরে সংক্রমক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়া একটা মারণব্যাধি। এর কোনো যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যা নেইও। সেই কবে কোনো এক কালে কোনো দ্বিতীয় বা তৃতীয় বর্ষের ছাত্ররা প্রথম বর্ষের ছাত্রদের ওপর

ভয়ংকর রূপ নিয়ে সমাজের দগদগে ঘা হিসেবে বিদ্যমান। মানবিক আবেদনে কাজ না হওয়ায় আইন প্রণয়নের মাধ্যমেই এই প্রতিকার ভাবনা শুরু হয়েছে।

র‍্যাগিং কী বা 'র‍্যাগিং' বলতে কী বোঝায় ?

'র‍্যাগিং'' শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে ইংরেজি' Rag শব্দ থেকে, যার অর্থ হল ক্রিয়া। কিন্তু এই ক্রিয়া শব্দের ব্যঞ্জনা এখন বহুবিধ। অভব্য আচরণ, উৎকট কৌতুক, আপত্তিকর ব্যবহার, উত্ত্যক্ত করা, পীড়ন করা, খ্যাপানো, ঠাট্টা করা, বা রসিকতা করা ইত্যাদি নানারকম শারীরিক বা মানসিক ক্রিয়াকাণ্ডকে বোঝায়। এককথায় 'র‍্যাগিং' হল এক ধরনের অত্যাচারমূলক ক্রিয়াকর্ম। একজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অন্য ব্যক্তির ওপর অথবা একদল ছাত্র অন্য কোনো ছাত্রের ওপর উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মৌখিক অশ্লীল গালিগালাজ বা অশ্লীল ক্রিয়াকলাপ করে, শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করে উল্লাসে মেতে ওঠে সাধারণত এই রকমের পীড়নমূলক আচরণকে 'র‍্যাগিং'

বলে। কেবল ছাত্রসমাজে নয়, বৃহত্তর এই র‍্যাগিং-এর বিষবাস্প ছড়িয়ে পড়েছে রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

র‍্যাগিং- প্রক্রিয়া ও বিভিন্ন রূপ, আতঙ্কের নানা রং-

যারা র‍্যাগিং করে তারা সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন-

শিক্ষাক্ষেত্রে : সাধারণত ছাত্রাবাস বা ছাত্রীনিবাসে নবাগত ছাত্রছাত্রীদের ওপর পুরোনো ছাত্রছাত্রীরা

দৈহিক ও মানসিকভাবে নিপীড়ন চালায়। যেমন- উদ্ভট, অশীল প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য করা, প্রচন্ড শীতের মধ্যে স্নান করতে বাধ্য করা, জোর করে মদ বা সিগারেট খাওয়া, অনেক সময় সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়া এইভাবে নবাগতদের জীবন একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এই আপত্তিকর বড়ো দাদা-দিদিদের নির্দেশ না মালনে বা মানতে না চাইলে কুৎসিত গালাগালি, চড়-থাপ্পড়

ইত্যাদি তো উপরি পাওনা হিসেবে জোটে। বিশেষত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে এর প্রাদুর্ভাব বেশি।

প্রশাসনের ক্ষেত্রেঃ প্রশাসনের ক্ষেত্রে একটা প্রবাদ প্রচলিত- 'রক্ষকই ভক্ষক'। পুলিশ দারোগা থেকে শুরু করে উচ্চপদস্থ অফিসারেরা নিম্নপদস্থ অফিসারদের ওপর অপমানজনক কথাবার্তা বলে নির্যাতন তো করেনই, উপরন্তু শারীরিক নিপীড়ন করে থাকেন।

সামাজিক ক্ষেত্রে : সমাজের প্রায় সর্বত্রই এই র্যাগিং-এর কুপ্রভাব লক্ষ্যণীয়। কেউ জমি বা বাড়ি কিনতে ক্লাব উন্নয়নের নামে প্রায় জোর করে টাকা নেওয়া। নানা অজুহাতে ডোনেশনের নামে এরকম আর্থিক অত্যাচার তথা র‍্যাগিং চলতে থাকে।

রাজনিতির ক্ষেত্রে : রাজনীতির ক্ষেত্রে র‍্যাগিং দু-রকমের এক স্থূলভাবে বোমাবাজি, দাঙ্গাসৃষ্টি, ভয় দেখানো ইত্যাদির দ্বারা এবং

দুই, সূক্ষ্মভাবে ভোটবাক্স দখল করা বা অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে ফাঁদে ফেলে ভোটারকে প্রভাবিত করা।

র‍্যাগিংঃ কারণ বা যুক্তি :

যারা র‍্যাগিং করে, তাদের পক্ষের যুক্তিগুলি বেশ হাস্যকর ও অযৌক্তিক বলে মনে হয়। কারণ তারা বাল- র‍্যাগিং-এর মাধ্যমে নবাগত ছাত্রছাত্রীদের সংশ্লিষ্ট কলেজের উপযুক্ত দৃঢ়চেতা করে গড়ে তোলার শিক্ষা দেওয়া হয়। এর দ্বারা পুরাতন ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ নিবিড় হয়। কিন্তু এই ধরনের যুক্তি র‍্যাগিং-এর পক্ষে মিথ্যে অজুহাত মাত্র। প্রকৃতপক্ষে মানুষের মধ্যে যে প্রভুত্বের পিপাসা নিহিত আছে তারই উৎকট প্রকাশ ঘটে র‍্যাগিং-এর মাধ্যমে। মূলত র‍্যাগাররা নিজেদের হিরো ভাবতে থাকে এই র‍্যাগিং-এর দ্বারা। আর একটা যুক্তি প্রায়শই শোনা যায় যে, আমরা যেহেতু প্রথম বর্ষে র‍্যাগড হয়েছিলাম, সেহেতু আমরাও আগামী প্রথম বর্ষের ছাত্রদেরকে র‍্যাগিং করব - এই আত্মশ্লাঘা কাজ করে। আর সমাজের ব্যাপকতর অংশে যে র‍্যাগিং চলছে তাতে রয়েছে

রাজনৈতিক নেতৃত্বের আশ্রয়পুষ্ট হয়ে দাদাগিরি করার মাধ্যমে ত্রাসের সঞ্চারের দ্বারা জীবিকানির্বাহ বা বাড়তি উপার্জনের আশা।

র‍্যাগিংঃ মারাত্মক কুফল ফলছে, এবার বন্ধ হওয়া চাই :

সাম্প্রতিক বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে আমরা জানতে পারি যে, র‍্যাগিং কত ক্ষতিকারক, মারাত্মক ফলের সৃষ্টি করেছে। সম্প্রতি বেশ কিছু মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কিছু ভয়াবহ ঘটনার কথা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখা গেছে, অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে একাধিক ছাত্র ও ছাত্রীরা কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে এবং বহু মর্মান্তিক ঘটনার শিকার হয়েছে। যেমন শিবপুর বি ই কলেজের একটি ছাত্রের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েগেছে এবং যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতেওঁ ঘটে যাওয়া এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হল স্বপ্ননীল। এরকম কত স্বপ্ননীলদের স্বপ্ন ম্লান হয়েগেছে তার ঠিকানা আমাদের কাছে

নেই। অনেকে র‍্যাগিং-এর আতঙ্কে সারাজীবনের মতো মানসিক প্রতিবন্ধী হয়ে গেছে। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন থমকে গিয়েছে।

র‍্যাগিংঃ প্রতিকারের উপায়, আতঙ্কমুক্তির বাসনা:

কোনো একজন মানুষের পক্ষে র‍্যাগিং প্রতিবাদ সম্ভব নয়। মানবিক আবেদন-নিবেদন, সমাজ সচেতনতা

ইত্যাদির দ্বারা র‍্যাগিং বন্ধ করা যায়নি। বরং র‍্যাগিং বন্ধ করার জন্য কতকগুলি পদক্ষেপ অবিলম্বে নেওয়া উচিত। যেমন —

১. নবাগত ছাত্রদের পুরাতন ছাত্রদের সঙ্গে না রেখে আলাদা ছাত্রবাসে রাখতে হবে।

২ . 'নবীনবরণ' বা 'চাত্রবরণ' অনুষ্ঠানটি সকলের সম্মুখে তথা শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীদের উপস্থিতিতেই করতে হবে। যাতে পুরোনো ছাত্ররা অভব্যতা করার সুযোগ না পায়।

৩. কোথাও কোনো র‍্যাগিং - এর খবর এলে তৎক্ষণাৎ অ্যান্টি র‍্যাগিং অ্যাক্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়ে ফেলা। এর পাশাপাশি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করলে র‍্যাগিং আতঙ্ক থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।

শেষ কথনঃ 'র‍্যাগিং' শব্দটি মুছে যাক

দানবের মুঢ় অপব্যয় কখনও ইতিহাসে চিরশাশ্বত অধ্যায় রচনা করতে পারে না। হৃদয়হীন মানুষ কখনোই মানুষের মনে চিরন্তন স্থান দখল করতে পারে না। তাই র‍্যাগিং করে যারা সমাজের প্রভূত ক্ষতি করে চলেছেন তারা ক্ষমার অযোগ্য। তাদের রুখে দেওয়ার

মাধ্যমে 'র‍্যাগিং' শব্দটিকে চিরকালের মতো মুছে দিতে পারলে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎরা সঠিক দিশায় পথ খুঁজে পাবে।

প্রাপ্তি গুহঠাকুরতা

দ্বাদশ শ্রেণী ঘ বিভাগ

(তোমরা এই বিষয়ে নিজের মতামত লিখে পাঠাতে পারো lotusbuds@mhsforgirls.edu.in এই আইডিতে, নির্বাচিত লেখা পরের সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।)

সুন্দর কিসে?

সবাই বলে সুন্দরবন নাকি সুন্দরী বন। তাই আমরা আজ বন্ধুরা মিলে সুন্দরবনে চড়ুইভাতি করতে এলাম। কিন্তু একি?

সুন্দরী নাম যার, একি তার সুন্দর,

পাখী নেই, মধু নেই, নেই কোনো বান্দর।

সুন্দরী গাছ নেই, নেই তার বিখ্যাত শুল,

মৌমাছি রেগে শুধু ফোটাচ্ছে হুল।

সুন্দরবনের এরকম অবস্থা দেখে আমরা হতবাক। পাশেই একটা বুড়ো গরান গাছ দেখি আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম….

কি কারণ বলো ভাই এই ভাবে হাসছো?

বিপাকে পরতে দেখে মশকরা করছো?

গাছ তখন গম্ভীর হয়ে বললো,

মানুষ বুঝছে আজ প্রকৃতির রাগ

হাসির কারণ জানে, রাজকীয়-বঙ্গ বাঘ।

সে থাকে বন-মধ্যে নদীর ওপার,

অনেক কষ্ট তার, রাজা সে সবার।

মাছ মাংস নিও না, সে নিরামিষ খায়,

মিষ্টিতেই হতে পারে একটা উপায়।

গাছের কথা শুনে আমরা আমাদের কাছে মজুত মিষ্টি নিয়ে ভয়ে ভয়ে বাঘ মামার কাছে উপস্থিত হলাম ও জানতে চাইলাম সুন্দরবনের এই অবস্থা কি করে হলো? বাঘ মামা যদিও মিষ্টি খেয়ে বড়ই আনন্দিত হলেন ও তিনি যা বললেন…..

কি চাও জানতে, কেনোই বা চাও

সে এক দস্যু, মধুকর রাও।

সুন্দরী গাছ দিয়ে বানাবে নাকি রকেট,

তাই দিয়ে হবে অনেক টাকা, ভরবে ওর পকেট।

বার বার ভালো করে বললাম, ভয় দেখালাম, গর্জন করলাম,
কোনো কথাতেই কান দিলো না।

প্রথমে বললো,

বানাবে ছোট্ট ডিঙি ,চাই বুড়ো গাছ শুধু

মৌচাক দিলো ভাঙি, কি করে হবে মধু?

মৌমাছি কাঁদে তাই, চলে গেছে ভিটে মাটি,

চলে গেলো দল - দল, পাবেনা আর মধু খাঁটি।

ডিঙি বিক্রি করে তার লোভ বেড়ে গেলো। এরপর সে বড় যন্ত্র চালিত নৌকো বানাবে ঠিক করলো। তাই এবার চোখ পড়ল তাজা গাছ গুলির ওপর।

শয়ে শয়ে গাছ কাটে, শন শন শব্দে,

বাঁদর পালালে সব, ডাল থেকে লাফ দে।

দেশী ও ভিনদেশী ছিল যত পাখী সব,

পালালো ভয়ে তারা, নেই কোনো কলরব।

তাকে ডেকে বললাম, কি করছেন মশায়, কি প্রয়োজন এত নৌকা বানাবার? সে আমায় ভয় না পেয়ে উল্টে ধমকে বললো যে নৌকো নাকি ভিন দেশে মধু পাঠানোর কাজে লাগবে। আমি তাকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করলাম যে সুন্দরবনে মধু আর হয়না, মৌমাছিরা পালিয়ে গেছে, তো সে রেগে আমায় চ্যেলা কাঠ দিয়ে

পিটিয়ে আমার ঠ্যাং খোঁড়া করে দিলে। দুঃখে, অপমানে আমি যেইনা ওপার ছেড়ে এপারে এলাম, সে পাগলের মতন বন কেটে পুর সাফ করে দিলে , এবার নাকি জাহাজ বানাবে।

ভটভটি নৌকা ডিজেল এর কল

তেল সব ঢেলে করে দূষিত যে জল

এই জলে ছিল যত ডলফিন, কচ্ছপ ও মাছ

চলে গেলো ভিনদেশে, নেই কেউ আজ।

ছিল যত পার গুলি আটকে শিকড়ে,

একে একে গেলো তলে, থাকি কি আকড়ে?

যেটুকু বন আছে অথবা অংশ, ভূমির

দখল করেছে সব, সাপ- খোপ ও কুমির।

জাহাজ বানিয়ে যদিও মধুকর অনেক অর্থ রোজগার করলো তবে তা কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধুদের নিয়ে আমোদে খরচ হয়ে গেলো। এ সবের ঘোর কাটতেই খেয়াল হলো, রকেট বানাতে হবে কারণ তা থেকে আসবে অনেক বেশি অর্থ। কিন্তু তার এই ইচ্ছে পূরণ হলোনা কারণ ততদিনে যে আর সুন্দরবনে গাছ নেই, পাখী নেই, বাঘ নেই, বাঁদর নেই, মৌমাছি নেই, কিচ্ছু নেই। যে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল উজাড় করে সে তার অট্টালিকা তৈরি করেছিল, সেটা আজ মরুভূমির হয়ে গেছে। সে তখন আমার কাছে এসে অনেক

অনুরোধ করলো সবাই কে ফেরাবার। কিন্তু তাকে আমি এবারেও বোঝাতে পারলাম না যে কেনো তা সম্ভব নয়। তাই আমি তাকে আমার কাছে আসতে না করে দিয়েছি।

থাকতে সময়, কান দাওনি, করেছো অবহেলা

দন্ড তোমায় পেতেই হবে এমনি ভীষণ খেলা।

তবে মধুকর কে না বললেও তোমাদের বলছি,

এখনো বোঝো, যত্ন করো পেয়েছ যা কিছু ভালো

নাহলে আর নিস্তার নেই, নাক - কান যত মলো।

প্রকৃতির' পর আঘাত হেননা, স্বার্থে নিজের যত,

পৃথিবীটাকে চলো করে তুলি, ঠিক স্বর্গের মত।

ঐশী কুন্ডু

ক্লাস সেভেন

দেবী প্রতিমার আত্মকথা

আমাকে এখন এক নতুন সবুজ পাড়ওয়ালা কমলা শাড়ীতে, অসংখ্য গয়না দিয়ে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। খুলে দেওয়া হয়েছে মন্দিরের প্রধান দ্বার। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রধান পূজারি এলে শুরু হবে সেই দৈনন্দিন আচার।

বুঝতেই পেরেছ হয়ত আমি কে। আমি হলাম এক দুর্গা প্রতিমা। জোকার এক মন্দিরে গত ৬ বছর ধরে অধিষ্ঠান করছি। প্রশংসা শুনে বুঝতে পারি যে আমাকে খুবই যত্নসহকারে গঠন করা হয়েছে। প্রত্যেক প্রতিমার মত আমারও কাজ - ভক্তদের আর্জি শোনা আর নিঃশর্তভাবে তাদের আশীর্বাদ করা। তবে কখনও কখনও ভক্তরা এতটাই আশ্চর্য করে যে আমি দ্বিধায় পরে যাই। একবার এক স্কুলপড়ুয়া ছেলে এসেছিল। বলে, "মা এবারে পরীক্ষাটা পাশ করিয়ে দাও, পরেরবার প্রমিস পড়ব। এবারটা একটু কৃপা করো।" অদ্ভুত তো! ছেলেটাকে কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে। আরে এ তো আগের বছরও এসেছিল না?

একই আব্দার নিয়ে? কেন বুঝতে পারছে না যে ও নিজে পড়াশোনা না করলে, আমি কেন, কোনো ভগবানই ওকে সাহায্য করতে পারবে না। মাঝেমধ্যে ভক্তরা দানপাত্রে ফেলে লাখ টাকা। পুজো করে দামী সরঞ্জাম, সবচেয়ে দামী পুজোর ডালি কিনে। তবে কখনই তাদেরকে দেখিনা মন্দিরের বাইরের ভিক্ষুকদেরকে দুটো পয়সাও দিতে। তখন, কষ্ট হলেও, বুঝতে পারি যে মানুষ অন্য মানুষের চেয়ে বেশী এক পাথরের প্রতিমাকে প্রাধান্য দেয়। একবার এক ভক্ত এসেছিল আমার কাছে, যার কথা আমার খুব পরিষ্কার মনে আছে।

তার মিনতি ছিল, "মা, এবারে আমার স্ত্রী তৃতীয়বার গর্ভবতী। এবারে অন্তত এক পুত্র সন্তান দাও।" রাগ এবং দুঃখের মিশ্রণে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। এসেছে, সে "দেবী" মূর্তির কাছে, তবে নারীর সম্মান করতে জানে না! তার গুরুত্ব বোঝে না! বলছে "মা", কিন্তু সেই মাও যে এক কন্যা মাত্রই। কথাগুলো মনে বিষবাণের মত লাগে, তবে এইগুলোই সমাজের তিক্ত সত্য, কঠোর বাস্তবতা।

প্রত্যেক মানুষকে যে মন্দিরে এসেই প্রার্থনা করতে হবে, এমনটা নয়। ভগবানকে অন্তরে স্মরণ করলেই, ভগবান আশীর্বাদ করবেন। তবে প্রকৃত মানুষের মত মানুষ হওয়াটা বেশী প্রয়োজন। শুনতে পাচ্ছি অসংখ্য পদধ্বনি। বোধহয় ভক্তরা এসে হাজির। শুরু হল এক নতুন দিন। শুনি আজকে কার কী বলার আছে!

-দেবপর্ণা ঘোষ,
নবম শ্রেণি

কোন এক সন্ধ্যেবেলায়

– মৃগাক্ষী মজুমদার ৭-ক

গরমের ছুটি পড়ে গেছে । ইস্কুল খুলবে আবার দেড় মাস পর। এবার গরমের ছুটিতে আমি দিদার বাড়ি যাব ঠিক হয়েছে । বাবাকে অফিসের কাজে মুম্বাই যেতে হবে বলে আমি এবার একা যাব । বাবা আমাকে ট্রেনে তুলে দেবে আর মামা বৈকন্ঠপুর স্টেশনে এসে আমাকে নিয়ে যাবে এটাই ঠিক হয়েছে ।

সমস্যা বলতে শুধু বর্ধমান স্টেশনে ট্রেন বদল । সেটা আমি নিজে সামলে নেব ভেবেছি ।

দেখতে দেখতে যাওয়ার দিন এসে গেল । বাবার সাথে হাওড়া স্টেশনে পৌছে গেলাম, মনের মধ্যে একটা ভীষণ উত্তেজনা অনুভব করলাম । সে যাই হোক, ট্রেনে উঠে বসলাম । আমার কামড়ায় হিন্দি ভাষী মধ্যবয়স্ক এক দম্পতি ছিল । ওদের সাথে বন্ধুত্ব করে নিলাম । বাবা আমাকে বিদায় জানাতেই ট্রেন ছেড়ে দিল । জানলার

বাইরে থেকে দেখলাম শহর ছেড়ে আমরা আস্তে আস্তে মফস্বলে ঢুকে গেলাম । একটা ঝালমুড়িওয়ালা ট্রেনের মধ্যে ঝালমুড়ি বিক্রি করছিল । আমার স্কুলের কথা মনে পড়ে গেল । আমাদের ইস্কুলের পাশে একটা ঝালমুড়িওয়ালা রোজ ছুটির পর ঝালমুড়ি বিক্রি করে । মাঝে মাঝে আমি মায়ের সাথে ঝালমুড়ি খাই । বাবা আমাকে ট্রেনে খরচের জন্য ২০০ টাকা খুচরো দিয়েছিল । সেখান থেকে ঝালমুড়ি কিনে খেলাম । ঘড়ির দিকে তাকাতে দেখলাম ৬টা বাজে, আরো দেড় ঘন্টা লাগবে বর্ধমান পৌছাতে । আমি বই পড়তে শুরু করলাম । আমি ভূতের গল্প ভালোবাসি তাই ড্রাকুলা বইটা পড়ছিলাম । এই উপন্যাসটি লিখেছেন ব্রাম স্টোকার । গল্পটা একটা রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ারের ওপর নির্ধারিত । অসহ্য গরমে মাঝে মাঝেই জল খেতে হচ্ছিল । আমার জলের বোতলে জল ফুরিয়ে গেল খুব জলদি ।

কিছুক্ষণ পরে ট্রেন এসে থামল রসুলপুর স্টেশনে । আমি জলের বোতল ভরার জন্য স্টেশনে নামলাম । পাশের সিটের কাকিমার থেকে জানতে পারলাম ট্রেন এখানে ২০ মিনিট থামবে । ট্রেন থেকে

নেমে জলের বোতলে ঠাণ্ডা জল ভরলাম । চোখে মুখে কিছুটা জল দিলাম । উফ ! যা গরম পড়েছে । ফিরে যাওয়ার পথে হথাৎ স্টেশনের একটা স্তম্ভে কি যেন একটা চিকচিক করে জ্বলে উঠল আর সাথে সাথে নিভে গেল । স্তম্ভের গায়ের ওপর একটা নম্বরপ্লেটে আমার চোখ গেল । ওর ওপর লেখা ছিল প্ল্যাটফর্ম নম্বর ৯ ৩/৪ । ততক্ষণে চারিদিকে অন্ধকার হয়ে এসেছে । কৌতূহল বসত আমি সেদিকে চলে গেলাম । হাতে আর ১০ মিনিট সময় আছে তাই তাড়া কিছু নেই । কাছে গিয়ে নানা ভাবে স্তম্ভটাকে পর্যবেক্ষণ করলাম । কিছুই পেলাম না । ভাবলাম একটু হাত দিয়ে দেখি। যেই না স্তম্ভের চকচকে যায়গায় হাত দিয়েছি অমনি একটা দরজা খুলে গেল । আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম । কিন্তু আমার কৌতূহল বরাবরই একটু বেশি, তার জন্য বাবা, মা, শিক্ষক শিক্ষীকাদের কাছে আমি বকাও কম খাইনি । একবার ভাবলাম, ধুর্, এসব নিয়ে অনুসন্ধান করে কি হবে ? ট্রেনে উঠে যাই । পরক্ষনেই মনে হল ব্যাপারটা দেখাই যাক না পরখ করে । দেখলাম একটা

শিড়ি নিচে নেমে গেছে । ভিতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার । নিচে নামতে গিয়ে পা হড়কে আমি পড়ে গেলাম ।

তারপর আর কিছুই মনে নেই । জ্ঞান ফিরতেই দেখি আমাকে ঘিরে রয়েছে কিছু অদ্ভুত দর্শন মানুষ । আমাকে একটা ঘরের মধ্যে রাখা হয়েছিল । ঘরটা ভাল করে দেখলাম । ঘরে কোন জানালা নেই, শুধু দুটো হেরিকেন জাতীয় লম্ফ জ্বলছে । ঘরটা অদ্ভুত রকম স্যাঁতস্যাঁতে । এই গরমেও কেমন ঠাণ্ডা লাগছিল । ঘরের মধ্যে যারা আমায় ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের সবার পরনে শুধু নিকশ কালো জামাকাপড় । আমার জ্ঞান ফিরেছে দেখে তারা একটু আশ্বস্ত হলেন। আমি একটু ধাতস্ত হয়ে ওনাদের জিজ্ঞাসা করলাম ওরা কারা, আমি কোথায়ে এসেছি, আমার ট্রেন কি ছেড়ে দিয়েছে?

ওনারা দেখলাম আমার প্রশ্ন শুনে যারপরনাই বিরক্ত হয়েছেন । সে যাই হোক, আমি নাছোড়বান্দা । শেষমেষ আমার সাথে না পেড়ে ওরা আমাকে ওদের দলনেত্রীর কাছে নিয়ে গেল । ওদের মুখেই

শুনলাম দলনেত্রীর নাম ফাক্রুন্নিসা। ফাক্রুন্নিসা আমাকে আলাদা একটা ঘরে নিয়ে গেল। ফাক্রুন্নিসা আমাকে নানাভাবে বোঝাতে লাগল আমি যেন ওদের সম্বন্ধে জানতে না চাই । ওরাই আমাকে পরের ট্রেনে তুলে দেওয়ার ব্যাবস্থা করবে, আর যা যা চাই সবই ওরা দেবে । একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করলাম ওদের মুখের বাংলা ভাষা আর আমাদের বাংলা ভাষার মধ্যে অনেক তফাৎ । মনে হল ওরা কয়েকশো বছর পেছনে রয়ে গেছে । আমি রাজি হচ্ছিনা দেখে অবশেষে ফাক্রুন্নিসা ওদের ব্যাপারে বলতে রাজি হল । শর্ত একটাই, আমি যেন এ কথা কাউকে না বলি । যেটা শুনলাম তা শুনে আমার বুকের ভেতরটা হিম্ হয়ে গেল ।

ফাক্রুন্নিসা আমাকে জানাল যে ওরা কেউ মানুষ নয় । মানুষের মত দেখতে হলেও ওরা আসলে একদল ভ্যাম্পায়ার, যাকে বাংলা ভাষাতে আমরা বলি রক্তচোষা । ফাক্রুন্নিসা আমার একটা ধারনা ভুল প্রমানিত করে দিল । ওরা রক্তলোলুপ হলেও মানুষের রক্ত ওরা পান করে না । পশু পাখির রক্ত পান করেই ওরা

জীবন নির্বাহ করে । রক্ত খেলেও ওদের বিশেষ নজর থাকে যাতে পশুটির প্রানহানি না হয় । ওদের শরীরে দয়া মায়া নেই এমনটা নয় । শুধু মাত্র প্রান রক্ষার্তে ওরা রক্তের সন্ধান করে। সূর্যের আলো সহ্য করতে না পারার দরুন ওরা রাতের দিকেই শিকার করে । আর জানলাম যে ভ্যাম্পায়াররা মানুষের সাথেই বসবাস করত পুরাকাল থেকে । কিন্তু ফারুখশিয়ার দিল্লির নবাব হওয়ার পর একটি গুজব ছরায় যে ভ্যাম্পায়াররা মানুষের রক্ত খাওয়া শুরু করেছে । ফারুখশিয়ার, একজন নির্দয় সম্রাট ছিলেন । উনি সারা রাজ্য থেকে ভ্যাম্পায়ার নিধনের আদেশ দেন। সারা রাজত্ব থেকে হাজারে হাজারে ভ্যাম্পায়ারদের কে সূর্যালোকে পুরিয়ে মারা হয় । খুব অল্প সংখ্যক ভ্যাম্পায়ার মাটির নিচে আস্থানা করে পালিয়ে বাচে । ফাক্রুন্নিসার দলটি তাদের মধ্যেই একটা দল । দেশে এরকম আরো কত দল আছে কে জানে । মানুষের থেকে এদের আয়ু ১০ গুন, তাই এত বছরেও ওদের মধ্যে বয়সের ছাপ নেই। ফাক্রুন্নিসার আদেশে আমাকে আবার উপরে নিয়ে যাওয়া হল । স্তম্ভের ভেতর থেকে ওরা আমায়ে বিদায় জানাল । স্তম্ভতা আবার আস্তে আস্তে বন্ধ

হয়ে গেল। হাত ঘড়িতে দেখলাম সকাল ৪ টে বাজে । আস্তে আস্তে ভোর হচ্ছে। আমাকে পরের ট্রেনের অপেক্ষা করতে হবে । আপেক্ষা করতে করতে ভাবলাম, এই যে পৃথিবীতে আমরা বসবাস করি, সেটা কি শুধু আমাদের? আমরা বাড়ি কিনছি, জমি কিনছি, স্টেশন বানাচ্ছি, ট্রেন চালাচ্ছি, ব্রিজ বানাচ্ছি, ভাবছি এই সবই মানুষের জন্য । কিন্তু এ পৃথিবীতে যে বাস করে মানুষ ছাড়া আরো কত প্রানি তাদের কি হবে? আমরা তো জঙ্গল কেটে রাস্তা বানাচ্ছি, শহর গড়ছি । এতে যে জঙ্গলের প্রানিদের কত কষ্ট হচ্ছে আমরা কি ভাবছি? আমরা ভ্যাম্পায়ারদের আমরা পালিয়ে মাটির নিচে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য করেছি, পৃথিবীতে কি তাদের সমান অধিকার নেই? এসব সাত পাচ ভাবতে ভাবতে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল । পরের ট্রেন আস্তেই উঠে বসলাম । ভাবলাম প্রতিজ্ঞা যখন করেছি, এ কথা কাউকে বলব না। কিন্তু লিখতে তো দোষ নেই ।